এই সময়

* কথাসরিৎ *

রাজনীতিতে কোনও কিছুই দুর্ঘটনাবশত ঘটে না। যদি তেমন কিছু ঘটেও, এটা জানবেন যে সেটার পিছনেও কোনও পরিকল্পনা ছিল।

— ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট

শাস্তি

ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকারের শাসনপর্বে যে ক'টি আশঙ্কাজনক সামাজিক প্রবণতার সূত্রপাত, তার মধ্যে অন্যতম, গোরক্ষাকে কেন্দ্র করে উগ্র এবং হিংসাত্মক রাজনীতি, এবং অজস্র প্রাণহানি। সমস্যাটির দু'টি দিক, একটি আইনি এবং অন্যটি রাজনৈতিক। যেহেতু ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, একটি সার্বিক প্রবণতার অংশ, অতএব তার প্রতিরোধে রাজনৈতিক পদক্ষেপ জরুরি। অন্য দিকে প্রয়োজন, অপরাধের দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তি। সৌভাগ্যবশত, গোরক্ষা-সংক্রান্ত মামলায় অন্তত একটি ক্ষেত্রে এমত নিদর্শন স্থাপিত হল। ঝাড়খন্ড আদালত মাংস-ব্যবসায়ী আলিমুদ্দিন আনসারি হত্যা মামলায় মোট এগারো জনকে শাস্তি দিয়েছে, যার মধ্যে আছে একজন স্থানীয় বিজেপি নেতা এবং গোরক্ষা সমিতির সদস্যবৃন্দ। বিশেষত তাৎপর্যপূর্ণ, মামলার গতি। মাত্র ন'মাসেই নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। সমস্যা হল, গোরক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য মামলাগুলিতে সেটি দৃশ্যমান নয়। আখলাক-হত্যা মামলার শুনানি ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে হলেও, এখনও চার্জশিট জমা পড়েনি। রাজস্থানে পেহলু খান হত্যা মামলায় অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস, বরং পেহলু খানের সঙ্গীদের বিরুদ্ধে গরু-পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। ঝাড়খন্ডেই ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে আরও দু'টি গোরক্ষা-সংক্রান্ত হত্যা ঘটেছে, কিন্তু সেই মামলাগুলিতেও অনুরূপ তৎপরতার কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি।

বিলম্বিত বিচারের ফলে সমস্যাটি গভীরতর হওয়ার আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই গবাদি পশুর ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যেই একটি গভীর শঙ্কার আবহ। যার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনীতি। সেই ভীতি থেকে মুক্ত করার অন্যতম প্রধান উপায় অভিযুক্তদের দ্রুত বিচার এবং অভিযোগ প্রমাণ হলে যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোরক্ষা-সংক্রান্ত হিংসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাজারে গবাদি পশু বিক্রির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নানা বিধিনিষেধ, যা বস্তুত পরোক্ষে স্বঘোষিত গোরক্ষকদেরই উৎসাহিত করে। সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় আইনটিতে রদবদল হচ্ছে। পরিবর্তনের সেই প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হওয়া দরকার, যেমন দ্রুততর হওয়া উচিত গোরক্ষা-সংক্রান্ত মামলাগুলির বিচারপ্রক্রিয়া। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা এবং স্বেচ্ছাচারী আইন গণতন্ত্রের বিকাশের পথে বাধা। তার ফলে যে রাজনৈতিক লাভও বিশেষ হয় না, তার প্রমাণ রাজস্থানে গোরক্ষা-কেন্দ্রিক হিংসার মূল কেন্দ্র আলোয়ারে উপনির্বাচনে বিজেপির হার।

শ্রম

অন্যান্য সামাজিক শ্রমের মতো গৃহকর্ম বা সন্তান মানুষ করাও যে শ্রম, এ নিয়ে অনেক দিনই সরব নারীবাদীরা। অন্য শ্রমের মতো এই শ্রমের জন্যও বেতন-ব্যবস্থা চালু করা উচিত কি না, এমন তর্কও উঠেছে বিস্তর। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে, শিশুসন্তানের লালন পালনের জন্য মায়েরা যে পরিশ্রম করেন সপ্তাহে, তা আড়াইখানা স্বাভাবিক চাকরির শ্রম-সময়ের সমান। বস্তুত সন্তানের লালন-পালন নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে নিজের পরিচর্যার জন্য পর্যাপ্ত সময় বার করতে পারেন না অধিকাংশ মায়েরাই। সে দিক থেকে মায়েদের কাজ যে কোনও সামাজিক শ্রমের থেকে কম কিছু নয়। বরং তার থেকে যে

উত্তর-পূর্বে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে বিজেপির জয়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বড়ো রাজ্যগুলির উপনির্বাচনে তাদের হার

প্রশ্ন হল, কংগ্রেস জোট গড়তে কতটা উৎসুক

আঞ্চলিক দলগুলি যে ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ, তা ভোটের ফল থেকে স্পষ্ট। বিজেপি নানা দলের সঙ্গে জোট বেঁধে যে ভাবে সাফল্য পেয়েছে, তা থেকে কংগ্রেসের শেখা উচিত। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত দেশে বেশ কয়েকটা উপনির্বাচনের ফলাফল বেরোল। তার সঙ্গে গত পয়লা ফেব্রুয়ারি, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বাচনের ফলকে ধরলে বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সাফল্য পরিষ্কার। নির্বাচনগুলো প্রত্যেকটি বড়ো রাজ্যে হয়েছে। তাই মার্চ মাসের তিন তারিখে কেন্দ্রের শাসক দল ও তাদের মিত্রশক্তির ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের মতো অতি ছোটো রাজ্যের বিধানসভা ভোটের জয়ের গুরুত্বের থেকে এই উপনির্বাচনগুলোর গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। নির্বাচনগুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ করলে তিনটে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, হিন্দি বলয়ে বিজেপির যে প্রভাব ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল তা কিছুটা স্তিমিত। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ থেকে বিজেপি ১৪৫টি আসন পায় যা গত লোকসভা নির্বাচনে তাদের মোট প্রাপ্ত আসনের (২৮২) অর্ধেকের বেশি। উপরোক্ত চারটে রাজ্যের সাম্প্রতিক উপনির্বাচনগুলোতে যে প্রবল বিজেপি-বিরোধী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে তা আগামী কয়েক মাস বজায় থাকলে কেন্দ্রের শাসক দলের যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে। মহারাষ্ট্র থেকে উত্তরপ্রদেশে এক দিকে কৃষক আন্দোলন চলছে। অন্য দিকে সামাজিক ন্যায়বিচারের রাজনীতির কিছু উদীয়মান তারকা এখন গুজরাট ও উত্তর ভারতে চোখে পড়ার মতো কয়েকটা সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। উপরন্তু এই মুহূর্তে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া কাজ করছে। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি (সপা) ও বহুজন সমাজ পার্টি (বসপা) নির্বাচনী জোট গড়লে যে কামাল হয়ে যায় তা গত ১৪ মার্চের উপনির্বাচনের ফল চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে। এই দুই দল বাবরি মসজিদ ভাঙা ও মণ্ডল রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ১৯৯৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জোট গড়েছিল। সেই নির্বাচনে একটি বড়ো স্লোগান ছিল 'মিলে মুলায়ম কাঁসিরাম, হাওয়া মে উড় গয়ে জয় শ্রীরাম'। তার প্রায় পঁচিশ বছর পর সপা এবং বসপা একজোট হতে বাধ্য হল বিজেপি-বিরোধী মঞ্চ-কে শক্ত করতে। সমাজবাদী পার্টির নতুন প্রজন্মের নেতা বসপা নেত্রীকে যিনি বুয়াজি (পিসি) বলে ডাকেন আর বিহারে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নতুন প্রজন্মের নেতা এ বার হিন্দি বলয়ে বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির বিজয়ের প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন। তার সঙ্গে সপা-র পিছনে যাদব ভোট এবং বসপার পিছনে যে জাতভ ভোট আছে তার যোগফল এই নির্বাচনে কাজ করেছে। এই দুই জাতের একসঙ্গে আসার কারণ, বিজেপির সঙ্গে থাকা ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ভূমিহার ও যাদব বাদে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অংশ এবং জাতভ বাদে দলিতদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশের মানুষ যারা ২০১৭ সালের বিধানসভায় বিজেপি-কে বিপুল ভোট দিয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদ। কিন্তু এহেন সরলীকরণ করে এই উপনির্বাচনকে ব্যাখ্যা করা মুশকিল। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিজেপির নির্বাচনী বিপর্যয় কেবল জাতপাতের হিসেব এবং উত্তরপ্রদেশে বড়ো দুই দল একত্রিত হয়ে নির্বাচন লড়ার বিষয় ছিল না। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর গড়ে এহেন পরাজয় এবং ২০১৪ সালের লোকসভা ও ২০১৭ সালের বিধানসভা ভোটের তুলনায় বিজেপির বিরুদ্ধে যে আক্রোশ মানুষ দেখিয়েছে, তা কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সর্বোপরি কৃষকদের সমস্যা নিরাময় করার যে প্রতিশ্রুতি বিজেপি দিয়েছিল, তা রক্ষা করার বিশেষ কোনও উদ্যোগ মানুষ দেখেনি বলেই।

দ্বিতীয়ত এই ফল কেবল রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষিতে আলোচনা করলে ভুল হবে। সম্প্রতি কয়েকটি আর্থিক কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিপঙ্গুতা ও অকর্মণ্যতায় বীতশ্রদ্ধ জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই নির্বাচনী ফল বললে অত্যুক্তি হবে কি? ছাপোষা চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত আয়কর দেয়। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক আয়কর ফাঁকি না দেওয়ার জন্য অর্থমন্ত্রক থেকে ব্রোঞ্জ বিভাগের প্রশংসাপত্র পায়। আর একটু বেশি রোজগেরে মানুষকে সরকার রৌপ্য, স্বর্ণ ও প্ল্যাটিনাম বিভাগের শংসাপত্র দিচ্ছেন। হিরের মুকুটগুলো হয়তো তাঁরাই পাবেন যাঁরা হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে ফেরত দেন না কিংবা 'দেবো না রাষ্ট্র তুমি কী করে নেবে' গোছের ভাব দেখিয়ে বিদেশে পালিয়ে গিয়ে আরামের জীবন কাটায়। এহেন বড়ো রাঘববোয়াল ঋণখেলাপী ও আর্থিক দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজির উদাহরণ যখন মানুষ একের পর এক দেখে চলেছে, তখন স্বভাবতই তাদের মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে বিমুদ্রাকরণের নীতি কার্যকর করার সময় চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত থেকে গরিব মানুষ যে ভাবে শত অসুবিধা সত্ত্বেও সরকারের উদ্যোগের উপরে আস্থা রেখেছিলেন তার পরিণতি কি তা হলে শেষে এই হল যে, সৎ মানুষ 'ওয়ার্ক ইজ ওয়রশিপ, অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি'-তে বিশ্বাস করবেন, দুর্নীতিমুক্ত ভারতের কথা মন দিয়ে শুনবেন এবং সুদিনের স্বপ্ন দেখবেন আর কিছু পেটোয়া ধান্দাবাজ পুঁজি, জনগণের কষ্টার্জিত টাকা নিয়ে সরকারকে লবডঙ্কা দেখাবে?

তৃতীয়ত, এই উপনির্বাচনগুলোর ফলে আর একবার স্পষ্ট হল যে আঞ্চলিক দলগুলো শক্ত মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৫২-১৯৬৭ সালের মধ্যে যেমন একদলীয় কংগ্রেস শাসনের ব্যবস্থা ছিল, যাতে সেই ধরনের আর একটা একদলীয় শাসনব্যবস্থা (যথা সংঘ পরিবার পরিচালিত বিজেপি শাসনব্যবস্থা) কায়েম না হয় সে দিকে খেয়াল রেখে তীব্র লড়াই করছে আঞ্চলিক দলগুলো তাদের জমি আগলে রাখতে। অন্য দিকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে কংগ্রেস ক্ষয়িষ্ণু থেকে ক্ষয়িষ্ণুতর হয়ে চলেছে। তাই তারা ওই সব রাজ্যে বিজেপি-বিরোধী ভোট না কেটে যদি আঞ্চলিক দলগুলোকে সমর্থন করে তবে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আগে যেমন তারা করেছে (২০০১, ২০০৯, ২০১১ নির্বাচনগুলোয় তৃণমূলের সঙ্গে জোট)। সম্প্রতি তৃণমূলের, কংগ্রেস প্রার্থীকে রাজ্যসভায় সমর্থন করা সে দিক থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ। ওড়িশাতে একের পর এক নির্বাচনে কংগ্রেস ধরাশায়ী হয়ে যাচ্ছে দেখে, বাংলায় অতীতে যেমন তৃণমূলের সঙ্গে নির্বাচনী গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছিল, তেমনই বিজু জনতা দলের সঙ্গে কেনই বা নির্বাচনী আঁতাত হবে না, সে বিষয়ে কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড একটু নতুন করে ভাবতে পারেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে যখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ স্পষ্ট, তখন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সদা-পরিবর্তনশীল রাজনীতির কৌশল পাল্টানো যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় তা বিজেপি-কে দেখে শেখা উচিত। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচন, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং সম্প্রতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বিজেপি কী ভাবে বড়ো, মাঝারি ও ছোটো আঞ্চলিক দলগুলোকে নিয়ে নির্বাচনী জোট গড়েছিল তা স্মর্তব্য।

অঞ্চলভিত্তিক রাজনীতির শিকড় যে ভারতে গভীর তার একটা উদাহরণ হল, সম্প্রতি কর্নাটকের কংগ্রেস, তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য প্রায় একটি আঞ্চলিক দলের মতো করে প্রকাশ করছে। কন্নড় ভাষাকে ব্যবহারিক দিক থেকে আরও বেশি প্রচার ও সেই রাজ্যের একটা আলাদা প্রতীকী পতাকাকে স্বীকৃতি দিয়ে কর্নাটক কংগ্রেস পালে কিছুটা হাওয়া পেয়েছে। ওই রাজ্যে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে এক দিকে ভয়ঙ্কর দুর্নীতির অভিযোগ ও অন্য দিকে কেন্দ্র-বিরোধী ইস্যুগুলোকে সামনে রেখে আগামী মে মাসের কর্নাটক নির্বাচন কংগ্রেস দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবিধের মাঝে ঐক্য নিয়ে গর্বিত হওয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, বিবিধকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া ছাড়া যে ঐক্য সম্ভব নয় সেটা হয়তো বুঝতে পারছেন। এবং তা করতে গেলে একদিকে যেমন তাদের নব-উদারবাদী নীতিগুলো থেকে সরে এসে কেইনসিয় ধারার উদারবাদী নীতি অবলম্বন করতে হবে, অন্য দিকে বিবিধ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে পাথেয় করেই একমুখী এবং এক রঙের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

এই অঞ্চলভিত্তিক রাজনীতিকে কেন্দ্রের শাসক দল কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক টোপ এবং কিছু ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী জোট করে সামলাচ্ছে। তা করতে গিয়ে কেন্দ্রের শাসক দল এবং তাদের মার্গদর্শক সংগঠনের অখণ্ড জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে ভজনা তার একটা প্রকট দ্বিচারিতা উন্মোচিত হচ্ছে। অন্তত তিনটে সীমান্ত রাজ্যে (জম্মু ও কাশ্মীর, বাংলা এবং ত্রিপুরায়) কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে বিজেপি নির্বাচনী গাঁটছড়া বেঁধেছে। জম্মু কাশ্মীরে তাঁরা পিডিপির সঙ্গে সরকার চালায়। পিডিপি বহু দিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরে 'আজাদি' ও স্বশাসনের দাবির পক্ষে। পশ্চিমবঙ্গে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে অনড় একটি দলের সমর্থনে বিজেপি ২০০৯ ও ২০১৪ সালের লোকসভায় পরপর দু'বার একজন সাংসদ পাঠায়। আর সম্প্রতি ত্রিপুরাতে তারা আলাদা একটা রাজ্য গড়ার জন্য উদ্যত একটা পার্টির সঙ্গে সরকার চালাচ্ছে। এই উদাহরণগুলো থেকে 'ভারত জোড়ো' না 'ভারত তোড়ো'র মধ্যে ঠিক কোনটা কেন্দ্রের শাসক দল বিশ্বাস করে তা বোঝা কঠিন।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

উপনির্বাচন ২০১৮

ওড়িশা

তিন দলের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ

নির্বাচন কেন্দ্র	বিজু জনতা দল	বিজেপি	কংগ্রেস
বিজেপুর বিধানসভা	৫৬.৬১	৩৩.৫৩	৫.৬৫

উত্তরপ্রদেশ

প্রধান দুই দলের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ

নির্বাচন কেন্দ্র	সমাজবাদী পার্টি	বিজেপি
গোরক্ষপুর লোকসভা	৪৯.৩১	৪৬.৯৫
ফুলপুর লোকসভা	৪৭.১২	৩৮.৯৫

মধ্যপ্রদেশ

প্রধান দুই দলের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ

নির্বাচন কেন্দ্র	কংগ্রেস	বিজেপি
কোলারস বিধানসভা	৪৮.১৬	৪৩.৪৪
মুনগাওলি বিধানসভা	৪৮.৮৯	৪৭.৪৩

বিহার

প্রধান দুই দলের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ

নির্বাচন কেন্দ্র	রাষ্ট্রীয় জনতা দল	জনতা দল (ইউনাইটেড)
জেহানাবাদ বিধানসভা	৫৫.৪৭	২৯.৮৮

নির্বাচন কেন্দ্র	বিজেপি	কংগ্রেস
ভাবুয়া বিধানসভা	৪৮.১৪	৩৭.০৩

নির্বাচন কেন্দ্র	রাষ্ট্রীয় জনতা দল	বিজেপি
আরারিয়া লোকসভা	৫০.০০	৪৩.৯৩

তথ্যসূত্র: ভারতের নির্বাচন কমিশন

বিন্যাস অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

অঞ্চলভিত্তিক রাজনীতির শিকড় যে ভারতে গভীর তার একটা উদাহরণ হল, সম্প্রতি কর্নাটকের কংগ্রেস, তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য প্রায় একটি আঞ্চলিক দলের মতো করে প্রকাশ করছে। কন্নড় ভাষাকে ব্যবহারিক দিক থেকে আরও বেশি প্রচার ও সেই রাজ্যের একটা আলাদা প্রতীকী পতাকাকে স্বীকৃতি দিয়ে কর্নাটক কংগ্রেস পালে কিছুটা হাওয়া পেয়েছে।